# HSC 2025

## GAMECHANGER!

### ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

## আর্লিবার্ড অফারে

কোর্সে এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

**userweb.utkorsho.org**

অথবা কল করো

**+88 09613 715 715**

উৎকর্ষ

# বাংলা-সহপাঠ

## লেকচার-১৬

লালসালু

এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

উৎকর্ষ

⇒ আধুনিক

জন্ম ⇒ চট্টগ্রামে

পিতৃভূমি ⇒ নোয়াখালী

⇒ মা → মারা যান

শেষ কর্মস্থল = প্যারিসে

{মৃত্যু বরণ}

লালসালু ⑦

{নোয়াখালী}

{জন্ম}

১৯২২

{স্বা + ব্যঙ্গ}

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

উৎকর্ষ

## নাটক

(i) বহিপীর
(ii) সুড়ঙ্গ

## (উপন্যাস)

১৯৭১

(i) চাঁদের অমাবস্যা
(ii) নয়নচারা
(iii) কাঁদো নদী কাঁদো
(iv) দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।
(v) লালসালু

# ঔপন্যাসিক পরিচিতি

## ব্যক্তিগত তথ্য

জন্ম : ১৯২২ সালে ১৫ই আগস্ট
জন্মস্থান : চট্টগ্রামের ষোল শহরে
পিতৃনিবাসঃ নোয়াখালিতে
পিতা : সৈয়দ আহমদুল্লাহ্
মৃত্যু : ১৯৭১ সালে

## সাহিত্য কর্ম

- উপন্যাসঃ
- নয়নচারা
- দুই তীর ও অন্যান্য গল্প
- লালসালু
- চাঁদের অমাবস্যা
- কাঁদো নদী কাঁদো

নাটকঃ
বহিপীর
তরঙ্গভঙ্গ
উজানে মৃত্যু
সুড়ঙ্গ

## পুরস্কার ও অবদান

এসএসসি '২৫
প্রিমিয়াম একাডেমিক কোর্স
এইচএসসি' ২৪
ফাইনাল প্রিপারেশন

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-প্রদেশেরও; হয়ত-বা আরও দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন-মান-ক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

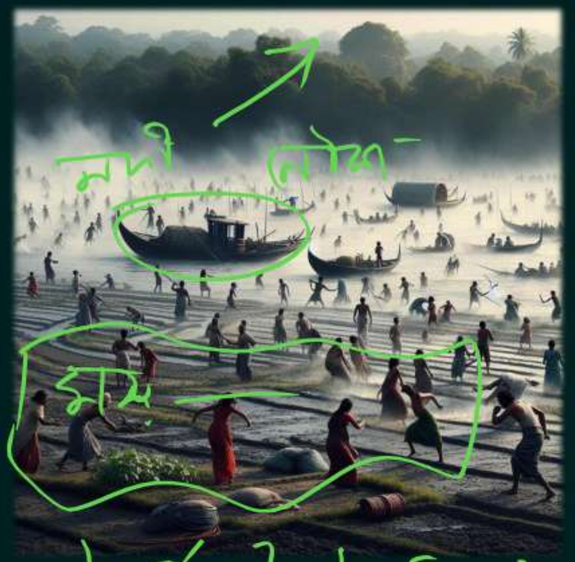

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌঁছোয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ।

রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে-তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা ছেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না-কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়-এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝংকারে,
উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ওঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয়।
ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।
কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে,
তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

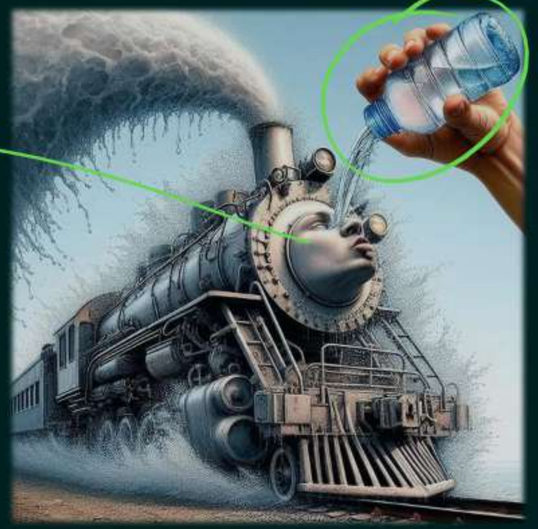

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।

ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপাড়া পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে।

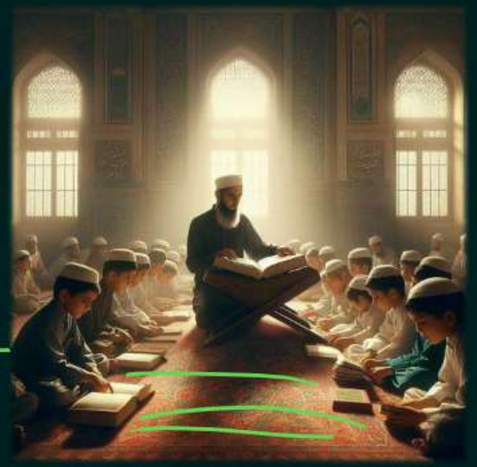

তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো-এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব, কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দুরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে আবার পরে।

চৌকোণ পাথর

$$\boxed{6.10 - 6.25}$$

কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ-এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়ত বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে-যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল- সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান। সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

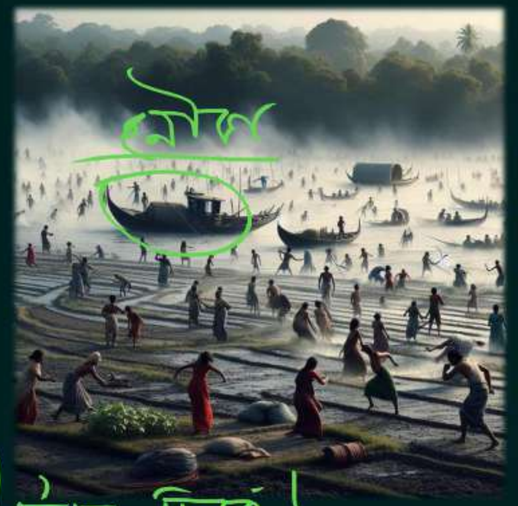


উত্তর দিকে

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

-আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

-আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে।বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে।কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের।তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে।বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কৃচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে-মৌলবির গলা।বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

শ্রাবণ → {নিরাক পড়া}

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়ত।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়- মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান-ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না।

সার্বক্ষণ

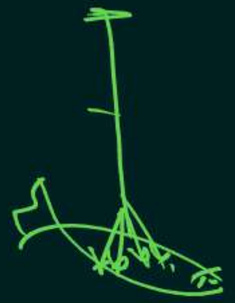

গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন- চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের এক প্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে- চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে ওঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে-নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরও বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয় ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে-ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। সা-ঝাক।

রুই

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হা-করে ভেসে ওঠে।
আবার নৌকা চলে।ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।
একসময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে।কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্য।হঠাৎ এক সময় দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব।সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই।নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে। কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে।মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়-সেদিকে দৃষ্টি নেই।

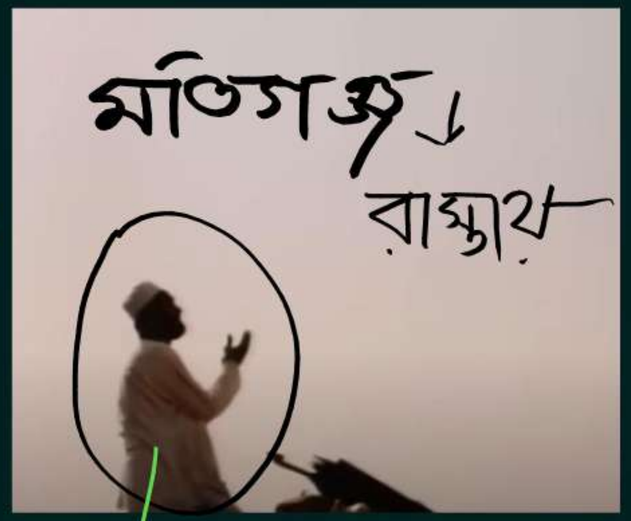


পাথরের মূর্তি

একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা-নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।

রাখছেন?

উৎকর্ষ

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলি ছিল। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

-আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি

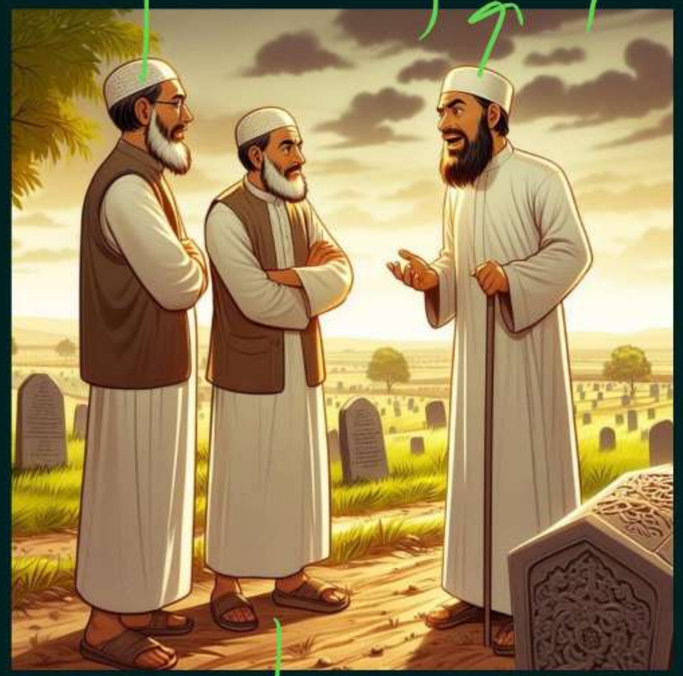

খালেক ব্যাপারী

মজিদ

মাতব্বর রেহান

মূর্খ

অজ্ঞাত

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

-আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

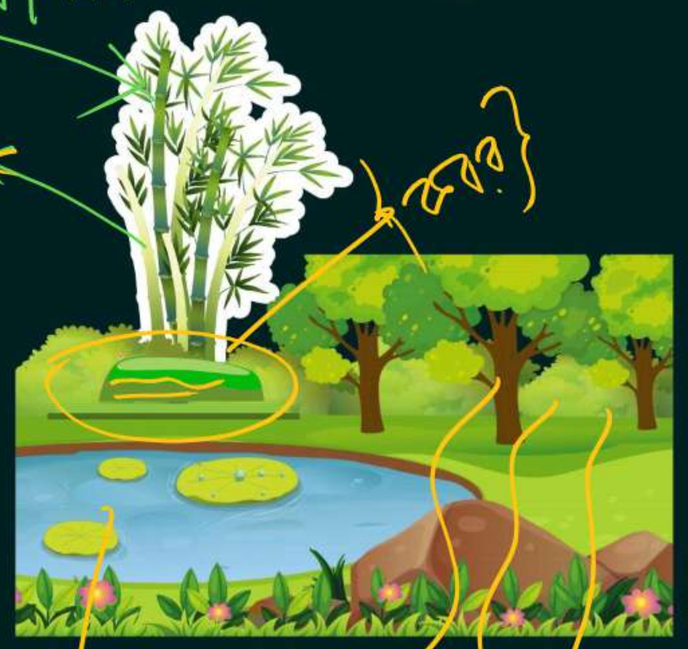

মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

-উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

অর্থ?

{বিং} {অস্তিত্ব ধ্বনি}

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের আধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

মোলেমান বয়াতি

জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠল; হাওয়ারও ভ্যাপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা- সালুতে আবৃত সঙ্গে পয়সা- ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

লাল সালুতে

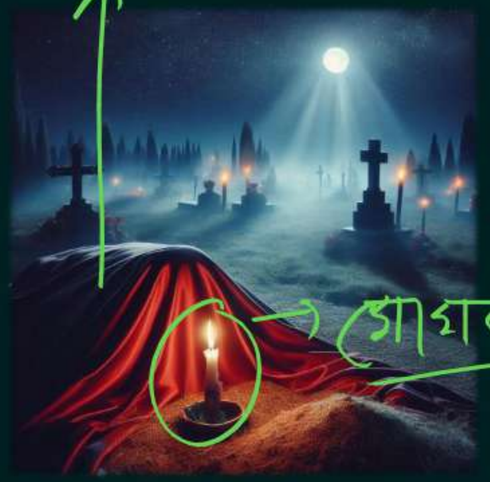

আগরবাতি

নষ্ট হওয়া যার স্বভাব

গুদাম ঘর

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো।হয়ত সামনের দিকে, হয়ত কোথাও নয়।সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে কৃচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে।ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ।তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেক দিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল।

শেষে সেই মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ। হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, -অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

-অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা-

থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে লাল কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে।দেখে রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

-অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে

যায়।

যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়ত দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তার বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়ত কাঠফাটা রোদ, হয়ত মুষলধারে বৃষ্টি-তারা পরিশ্রম করে চলে।

অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে-তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা-ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে

জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে-ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে-মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সঙ্গে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়ত না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়ত করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বরে গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে রহিমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না। শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন

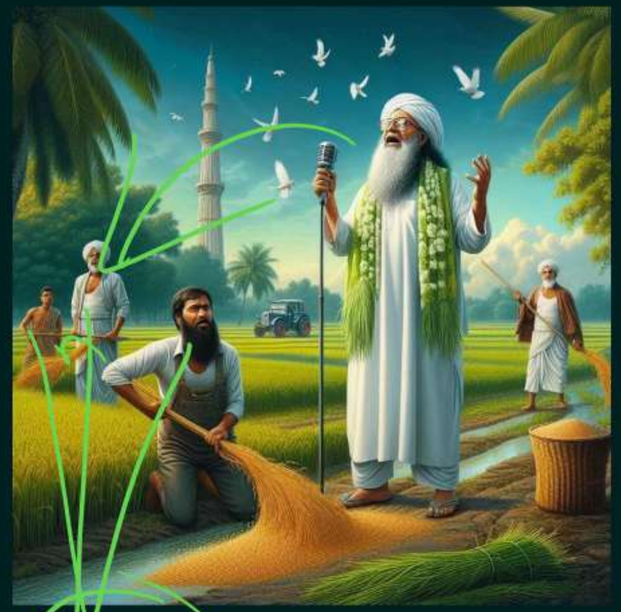

গান

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা-এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে, -কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

-হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

দুদু মিঞা

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল।সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে।বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে।বলে,

-আমি গরিব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়ত সে জানে।কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়।ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়।আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে-গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

-কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে।এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে।ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে।শৈশবের স্মৃতি-যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান-সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

-ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কন্না শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি।শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

-গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

-হইছে হইছে, ভাগ।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে-শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ এই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল। মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত-সবার মনে সে-ছবি স্পষ্ট।

প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে।কিন্তু ওরাই আজ একে চেনে না।কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে।খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে।বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।

রহিমা শোনে তাদের কথা।কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে।মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল।তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো।তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।ভাবে, কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন- যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায় বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে।তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন।আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না।অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে-না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে।হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে-ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রুপালি ঝালর।রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়।মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমসার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে! ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে।ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগ যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও।খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে-তার ওপর করুণা কর, রহমত কর।চার গ্রাম পরে বড় নদী।ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক।তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে।যেমন আসে ধান-ভানুনি হাসুনির মা।বহুদিন আগে নিরাক পড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা।সে এসে বলে,

-আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়।কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে।

হাসুনির মা বলে, -আমার আর্জি- ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;

-ক্যান গো বিটি?

-জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু।আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,

-তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

মা

হাসুনি

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর জোগায় মুখে।

-তুমি নিবা বুবু তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।রহিমা হাসে।হাতে কাঁথার কাজ।হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

-আমার এক আর্জি বুবু।

-কও?

ওনারে কইবেন- বুড়াবুড়ি দুইগারে জানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

-ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

-হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু।দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো।কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে।তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়।ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ ধরা হাড় কড়কড় করে।বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না।এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়।

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা।সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে।তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে-আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ।তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে।ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,
-হুনছস্ কথা, হুনছস?
ছেলেরা সমস্বরে বলে,
ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।
সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে।তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে।কাদের বোঝায়,
-থাক, কইবার দেও।খোদাই তার শাস্তি করবো।
জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উত্তর শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়।তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।
-হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক-নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।
হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছলছল করে ওঠে।বলে,
-তুমি দুঃখ করিও না বিটি।আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে।দুস্থা মেয়ে।স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে।বাড়িতে তিন তিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়।এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না।তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান।বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের।সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে।তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে।কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

-শ্বশুরবাড়িতে যাওনা ক্যান?

-অরা মনুষ্যি না।

-নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই।তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই।মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়।এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

-শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

-খানকির বেটি নিকা করবো বইলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী।তাহের কৌতুক বোধ করে।বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল।কথা গায়ে মাখে না।হেসে বলে,-গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

[MCQ]

দূরে ধানক্ষেত্রে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ।ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে।আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়;

নিকা করবি ~~মাগি~~, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে।গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়।এলে বলে, তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে।মজিদ ধক্কে ওঠে।

-কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

-তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যান্নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,

-আমি জানি কী কয়।কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

[নিকা→২য় বার বিয়ে]

[৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত]